বেদে গোরক্ষা অথবা গোহত্যা ?

প্রো. উমাকান্ত উপাধ্যায়
আচার্য্য
আর্য সমাজ, কলকাতা

প্রকাশক
আর্য সমাজ বড়বাজার
১, সদরউদ্দীন লেন,
কলকাতা-৭০০০০৭

বেদে গোরক্ষা
অথবা গোহত্যা ?

লেখক ঃ

প্রো. উমাকান্ত উপাধ্যায়

আচার্য্য

আর্য সমাজ, কলকাতা

অনুবাদক ঃ

পণ্ডিত নচিকেতা ভট্টাচার্য্য

আর্য সমাজ, কলকাতা

প্রকাশক

আর্য সমাজ বড়বাজার

১, সদরউদ্দীন লেন,

কলকাতা-৭০০০০৭

বেদে গো রক্ষা
অথবা
গোহত্যা ?

প্রশ্নের মূল

সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসছে। সত্যযুগে এই প্রকার কোন দ্বন্দ্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু ত্রেতাযুগে মহারাজ রঘু থেকে শুরু করে শ্রী রামচন্দ্র পর্যন্ত বহু দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান। শ্রী রামচন্দ্রের সময়ে একদিকে রাক্ষস-সংস্কৃতি অন্যদিকে দেব এবং আর্যগণ ছিলেন। রাম রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে ঐ সংস্কৃতির সংঘর্ষের নির্ণায়ক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়, এবং রাক্ষস সংস্কৃতিতে ভাটা পড়ে। এই সংস্কৃতি ইউরোপের কিছু অংশে এবং আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইউনানী, আরব, হুড়ো ইত্যাদির মধ্যে রাজকীয় সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে এই রাক্ষস অসুর সংস্কৃতির প্রতিনিধি রূপে মগধের জরাসন্ধ এবং মথুরার কংসকে চিহ্নিত করা যায়। আসুরিক বিচারধারার প্রচার প্রসার করতে গিয়ে কংসকে যখন অধিক পরিমাণে কাঠিণ্যের সম্মুখীন হতে হল তখন তাঁর পরামর্শদাতা মন্ত্রীগণ এক যোজনা গ্রহণ করেন।

"তস্মাৎসর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুধাঃ।।

শ্রী মদ্‌ভা. ১০-৪-৪০

অর্থাৎ—হে রাজন্। যদি বেদ-ব্রাহ্মণ গো ভক্তদের পরাজিত করতে সংকল্প করেন, তাহলে সর্বান্তকরণে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে ব্রহ্মবাদী বেদ প্রচারক, তপস্বী যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের হবির সহায়ক গোরুগুলি হত্যা করান। এই ছিল গো-ব্রাহ্মণ বেদ বিরোধী আয়োজন। ভারতে এই আয়োজনের হোতা ছিলেন কংস এবং জরাসন্ধ প্রভৃতিগণ। এছাড়া বিদেশেও এই প্রকার নেতার সন্ধান পাওয়া যায়।

পরম্পরা অনুযায়ী ভারতীয় ঐতিহাসিক বিদ্বানগণের বিচারে, মহাভারতের যুদ্ধের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে স্বার্থী, অনার্য্য, আসুরিক বৃত্তি অঙ্কুরিত হতে শুরু করে এবং মহাভারতের সময়ে এদের সমর্থক যত্র তত্র দৃষ্টি গোচরে আসতে শুরু করে। মহাভারতের শান্তি পর্বে পাওয়া যায়—

সুরামৎস্যাঃ পশোর্মাংসম্ আসবং কৃশরৌদনম্।
ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং যজ্ঞে, নৈতদ্‌বেদেষু বিদ্যতে।।
অব্যবস্থিতমর্যাদৈঃ বিমূঢৈর্নাস্তিকৈর্নরৈঃ।
সংশয়াত্মভিরব্যক্তৈর্হিংসা সমনুবর্ণিতা।।

শান্তিপর্ব অ ০ ২৬৩-৯

উপরিউক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই রূপ—যজ্ঞে মদ, মৎসসেবন, পশুমাংস, মাদক দ্রব্য ইত্যাদির প্রয়োগ ধূর্ত্তদের কীর্ত্তি। মর্যাদাভ্রষ্ট সংশয়াত্মা, মূর্খ নাস্তিকরাই পশু হিংসার প্রচার করে। **"ন এতদ্ বেদেষু বিদ্যতে"**—অর্থাৎ বেদে এই সকলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি কেবল মাত্র ধূর্ত্তগণের চেষ্টা।

এ থেকে বোঝা যায় যে মহাভারতের যুগে পশু হিংসা আদির প্রচার শুরু হতে থাকে। জনতা, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ডী তা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। এই প্রকার প্রক্ষেপ-মিশ্রণ বেদে করানো সম্ভব হয়নি, কারণ এটিকে ধর্ম বলে স্বীকার করে কণ্ঠস্থ করা হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-স্মৃতিতে মাঝে মধ্যে নিজেদের স্বার্থ বিধানের অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়। **"ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতেদ্"**। এই প্রকার প্রক্ষেপের ঘোর অন্যায় দেখে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী নির্দ্বন্দ্ব ঘোষণা করলেন যে, বেদ সংহিতা স্বতঃ প্রমাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থ যদি বেদের অনুকুলে হয় তবেই প্রমাণ বলে স্বীকার করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। অতএব বেদ স্বতঃ প্রমাণ, অন্যান্য বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণ নয়।

শ্রী মাধবাচার্য আনন্দতীর্থজী মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয় করতে লিখছেন—

ক্বচিদ্ গ্রন্থান্ প্রক্ষিপন্তি, ক্বচিদন্তরিতানাপি।
কুর্য়ুঃ ক্বচিচ্চ বত্যাসং, প্রমাদা ত্ত্বচিদন্যথা।।
অনুৎসন্না অপি গ্রন্থাঃ, ব্যাকুলা ইতি সর্বশঃ।।

কুম্ভ ঘো০ সংস্ক পৃ ৯০৭

অর্থাৎ—সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বংসকারী ধূর্তগণ কোথাও কোথাও প্রক্ষেপ গ্রন্থে ভেজাল, কখনও কখনও পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে গ্রন্থে পাঠান্তর করে দেয় এবং ধূর্ত্ততাবশতঃ গ্রন্থকে ভিন্নরূপ প্রদান করে। এই প্রকার ঘটনার জন্য যে সকল সৎগ্রন্থ নষ্ট হয়নি সেই সকল গ্রন্থের প্রতি উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। এই বক্তব্য কোনও আর্য সমাজের বিদ্বানের নয়,

এ তো শ্রী মাধ্বাচার্য আনন্দতীর্থ মহাশয়ের বেদনা। যে কোন নিরপেক্ষ সত্যাগ্রহী বিদ্বান এই প্রকার প্রক্ষেপ কাণ্ডকে অস্বীকার করতে পারে না।

মহাভারতের পরবর্ত্তী মধ্যকালের পরিস্থিতি

মহাভারতকাল পর্য্যন্ত হিংসা বিধানের আধিক্য ছিল না। কিন্তু নির্ণায়ক বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের এই প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, "ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্তিতমেতদ্" ধূর্ত্তগণের প্রচার। মহাভারতকালে বিনাশকারী যুদ্ধের ফলে সমস্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত বিকৃত রূপ ধারণ করে। পঠন পাঠন, গুরুকুল ও ঋষি আশ্রমের সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে পড়ে। ঋষি-যুগ শেষ হল। মহর্ষি ব্যাস এবং জৈমিনি পরম্পরানুযায়ী অন্তিম ঋষি বলে পরিগণিত হলেন। মহামুনি পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুনিযুগেরও সমাপ্তি হল। ঋষিমুনি যুগের যবনিকার পরবর্ত্তী সময়ে স্বার্থপর ধূর্ত্তগণের মাধ্যমে সমাজ প্রতারিত হতে শুরু করে। পশুহিংসাদির প্রচার আরম্ভ হয়। **কিন্তু পশু হিংসা, মদ্যপান ইত্যাদির প্রবৃত্তি জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। জনতা সামান্যরূপে পশু হিংসা, মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদিকে নিজেদের থেকে দূরে রাখে, এবং ইহাকে কদাচার, দুরাচার বলে গণ্য করতে শুরু করে, যার অদ্যবধি কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়নি। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও জনগঙ্গার জীবন-চরিত্রের অজস্রধারা আজ পর্য্যন্ত নিজ পবিত্রতা রক্ষা করে চলেছে। বর্ত্তমান যুগেও এই সকল কদাচার, কুৎসিত-ব্যবহারকে জনসাধারণ পবিত্রতা-সদাচারের মোহরে অঙ্কিত করেনি।**

জনসাধারণ তখনও গ্রহণ করেনি, এখনও স্বীকার করে না, কিন্তু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ পশুযাগ, মদিরা, ব্যভিচার ইত্যাদির প্রচার শুরু করে, সেও আবার বেদের নামে, বেদের মোহর ব্যবহার করে। বেদের যথাযথ বিদ্বানের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বলতে পারা যায় না যে—

"ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্তিতং যজ্ঞে, নৈতদ্ বেদেষু বিদ্যতে।"

এ সকল বেদের নয়, ধূর্ত্তোদের মায়া। বেদের মধ্যে মাংস, মদিরা, কদাচার দেখে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতিগণ বেদের বিরোধ করতে শুরু করেন।

স্বামী শংকরাচার্যের আগমন—মহাভারতের আড়াই-তিন হাজার বছর পর জগৎগুরু স্বামী শংকরাচার্যের জন্ম। বালক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, এই অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ধর্মোদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, চার্বাক

ইত্যাদির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেদের নামে যে অনর্থ ও অপপ্রচার চলছিল, তার জড়োৎপাটন করার পূর্বেই ৩০-৩২ বৎসরের অল্পায়ুতেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন। ফলে বেদের নামে যে কদাচার, পশুহিংসা, মদ্যপানাদি চলছিল তা বর্ত্তমান রইল।

সায়ণাচার্যের আগমন—সায়ণাচার্যের আগমনকাল খৃষ্টাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে, স্বামী শংকরাচার্যের প্রায় ১৬০০ বৎসর পরে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক যাগ-যজ্ঞ চলছিল। জৈন বৌদ্ধগণের ভাটা পড়ায় সাম্প্রদায়িক বামমার্গী কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ডতা পরিলক্ষিত হয়।

সায়ণাচার্য বুক্ক নরেশের মন্ত্রী ছিলেন। বিজয়নগর গোলকুণ্ডার রাজা হিন্দু সংস্কার-যুক্ত ছিলেন। উত্তর ভারতে মুসলমান রাজারা প্রবল পরাক্রমী হতে শুরু করেন। এখানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার চলছিল। বুক্ক নরেশ সায়ণাচার্যকে হিন্দু ধর্মের পুস্তক সমুদায় ভাষ্য করার জন্য নিযুক্ত করেন। আজ থেকে প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে সাম্প্রদায়িকতা, ধূর্ত্ততা এবং মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার ভাবনা চিন্তা শক্তিশালী হতে শুরু করে। সায়ণাচার্যের সময়ে সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং ধার্মিক পৃষ্ঠভূমি ছিল ঠিক এই প্রকার। সুতরাং আচার্য সায়ণের ভাষ্যকে যথার্থবক্তা, আপ্তপুরুষ এবং ঋষিগণের পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নয়। ওঁর মধ্যে তাৎকালীন ত্রুটি, সাম্প্রদায়িকতা ও ঋষি পরম্পরা থেকে পৃথকতা সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে ঋষি অরবিন্দের সম্মতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা বাঞ্ছনীয়—*

যদি কোন বিদ্বত্তাপূর্ণ চাতুর্যের কোষ থাকে, সাধারণতঃ বিদ্বতার যেমন গম্ভীর নির্ণায়ক শক্তি, নিশ্চিত রুচি, যথার্থ সমালোচনাত্মক, তুলনাত্মক নিরীক্ষণ, ঋষিদের সাক্ষাৎ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং অত্যন্ত সাদামাঠা বুদ্ধি হতেও দূর এবং তা থেকে রহিত, যার মধ্যে পূর্ব চিন্তাশীলতানুযায়ী বেদমন্ত্র সকল প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে প্রয়োগের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল সেটি সায়ণাচার্যের ভাষ্য—যা বিশাল, চমৎকার প্রথম অপরিস্কৃত সামগ্রী রূপে ততটাই উপযোগী এবং বৈদুষ্যপূর্ণ।

ইউরোপের বিদ্বানগণের সংস্কৃত ভাষাদির বিষয়ে তেমন যোগ্যতা না থাকায় মূলবেদ বোধগম্য হয়ে উঠেনি। তাঁরা সাধারণতঃ মধ্যকালের আচার্যগণ—সায়ণাচার্য, মহীধরাচার্য আদিগণের ভাষ্যের আধারে নিজেদের মতামত প্রদান করতেন। মাঝে মধ্যে তাঁরা এই কথা স্বীকারও

---

* বেদোঁ কা যথার্থ স্বরূপ পৃ-৫৫-৫৬।

করতেন। শ্রী ক্লেটন (Claton) সায়ণাচার্যকে আধার এবং শ্রী গ্রাফিথ্ মহীধরাচার্যকে নিজের উপজীব্য বলে উল্লেখ করেন। গ্রাফিথ্ তাঁর অনুদিত যজুর্বেদ-এর ভূমিকায় স্বীকার করেছেন—

"All that I have attempted to do is to give a faithful translation to the best of my ability, of the texts and sacrificial formulas of Vedas, with just sufficient commentary ; chiefly from Mahidhar, to make them intelligible."

অর্থাৎ "মহীধরের ভাষ্যের আধারে আমার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ অনুসারে আমি যজুর্বেদের মন্ত্র ও যজ্ঞকে বোধগম্য করাতে প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।"

মহীধারাচার্য স্বয়ং তান্ত্রিক ছিলেন এবং তাঁর ভাষ্যে পশুহিংসা, অশ্লীলতা ইত্যাদির সমর্থন করা প্রাচীন ঋষিদের পরম্পরার বিরুদ্ধে গিয়েছে। এই সকল সাহিত্য হাজার বছরের পুরোনোও নয়, ফলে বৈদিক সিদ্ধান্ত অথবা প্রাচীন আর্য পরম্পরার সম্বন্ধে সত্য-বাস্তব মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়না। আর্য পরম্পরার জন্য সেটিকে আধার রূপে গণ্য করা অন্যায়।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ—ম্যাক্সমূলর, মোনিয়র উইলিয়ামস, গ্রীফিথ্ প্রভৃতি সংস্কৃতের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমস্যা ছিল যে, তাঁদের পরম্পরানুগত রীতিতে সংস্কৃত পাঠের সুযোগের অভাব। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যক্তিগত অনুভব ছিল এই যে, পশ্চিমী পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত পত্রও অবোধ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে অনুসন্ধান কার্যের পটুতা, কোষ নির্মাণ ইত্যাদির জ্ঞান ছিল এবং তাঁরা কয়েকটি উপযোগী কর্মের নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁদের পুরাবিদ্যা, ভারতীয় ঐতিহ্য (Indology) ইত্যাদির মধ্যে স্বার্থ নিহিত আছে। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের প্রচ্ছন্ন কামনা পরিলক্ষিত হয়।

পরম্পরা অনুযায়ী সংস্কৃত বিদ্বান্ ও অধ্যাপকদের অভাব বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁদের দ্বারা মূলগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা সম্ভবপর হয়না, কারণ তাঁরা পূর্বসূরীদের গ্রন্থসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করেন। অনুসন্ধানের নামে প্রয়োজনীয় তথ্য সামগ্রী মূল গ্রন্থ থেকে অল্প ও পূর্ব বিদ্বানগণ রচিত গ্রন্থ সমূহ থেকে অধিক গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইউরোপ এবং বিশেষ ভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডংকা বাজছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন্ চেয়ার নামক একটি চেয়ার (ট্রাস্ট) স্থাপন করা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সংস্কৃত চর্চা ও প্রচারের জন্য ঐ ব্যবস্থা করা হয়নি বরঞ্চ খৃষ্টান ধর্মের প্রচার ও গ্রাম্য ভারতীয়দের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা শুরু হয়। প্রো. মোনিয়র উইলিয়াম্স-এর বক্তব্য দেখুন ঃ—That the special object of his (Boden's) munificent request was to promote the translation of the scriptures into Sanskrit, so as to enamble his countrymen to proceed in the "conversion of the natives of India to the Christian religion."

মোনিয়র উইলিয়ামের উক্তি উদ্ধৃতি করার তাৎপর্য্য এই যে লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পঠন পাঠনের নিমিত্ত বোডেন ট্রাস্ট "বোডেন চেয়ারের" স্থাপনা করা, যার মূল উদ্দেশ্য ধার্মিক গ্রন্থসমূহের বাংলায় অনুবাদ করার মাধ্যমে ভারতীয়দের খৃষ্টধর্মে রূপান্তরিত করার কাজে ইংলণ্ডের ব্যক্তিগণ অগ্রসর হতে পারেন।

এই যোজনার মূলে পূর্ব পরিকল্পিত ধর্মান্তরিত করার যেরূপ মানসিকতা কাজ করছিল তা বিচার্য বিষয়। ম্যাক্সমূলর আদিগণের কার্য পদ্ধতি থেকে তা বিচার করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহিত্য, ইতিহাসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে এক বিশাল প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়।

মোনিয়র উইলিয়াম্-এর "Sanskrit English Dictionary" আজও উক্ত বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। এ সকল ইংরেজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বৃহৎ পরিকল্পনা সমূহের একটি অঙ্গ। এই পরিকল্পনার কর্ণধার ছিলেন লর্ড "মেকলে"। তিনি ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ঐ পরিকল্পনার বৃহৎ অঙ্গ ছিল ইংরেজি ভাষাকে ভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা করা। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রমাণ লর্ড মেকলের উক্তিতে পরিলক্ষিত হয়।

"English Education would train up a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."

অর্থাৎ "ইংরেজি শিক্ষা এমন এক শ্রেণী তৈরি করবে, যারা রক্ত ও বর্ণগত দিক থেকে ভারতীয় হলেও রুচি আচার আচরণ, বিচার ও ব্যবহারে ইংরেজ হবে।"

ইংরেজ সাম্রাজ্যের নীতি ছিল এটাই, যার কূটনীতি ভারতের

স্বতন্ত্রতার পঞ্চাশ বৎসর পরেও বৌদ্ধিক স্বতন্ত্রতা আসতে দেয়নি। প্রোফেসর ম্যাক্সমূলর থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং ইতিহাসের অধ্যাপক এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন নি।

এখন ম্যাক্সমূলারের ভাবনার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—প্রোফেসর ম্যাক্সমূলরের পত্নীকে প্রদত্ত এক পত্র থেকে তাঁর মত একজন বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বানের খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিষয়ে ধর্মান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রের ভাষা এবং ভাবনা অনুযায়ী বিচার করুন যে এই বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা-ভারতীয় বিদ্যার (Indology) ছদ্মরূপ প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতবাসীকে কোন ধর্মান্ধতার অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এটি কি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার কিংবা ধার্মিক ছল? ম্যাক্সমূলার নিজের পত্নীকে পত্রে লেখেন ঃ

"I hope I shall finish that work (the publication of the Rig Veda with its English translation) and I feel convinced, though, I shall not have to see it Yet, this edition of mine (of the Rig Veda) and the translation of Vedas will hereafter tell to great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, the only way of uproating all that has been sprung from it during the last three thousand years." *

অর্থাৎ "আমার আশা যে ঐ কাজ (বেদের অনুবাদ) আমি সম্পূর্ণ করব এবং আমার বিশ্বাস যে আমি যখন থাকব না তখনও আমার ঋগ্বেদের এই সংস্করণ এবং বেদের অনুবাদ ভারতের ভাগ্য এবং লক্ষ ভারতীয়দের আত্মিক বিশ্বাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। বেদ তাদের ধর্মের মূল এবং এই মূল তাদের সামনে প্রদর্শন করা একমাত্র অসংদিগ্ধ প্রক্রিয়া যা ঐ সকল (বিশ্বাস-ভাবনা-শ্রদ্ধা) যা গত তিন হাজার বৎসর ধরে অঙ্কুরিত হয়েছে তা উৎপাটনের একমাত্র উপায়।"

তথাকথিত বিদ্বান ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতবর্ষে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচারে উতলা হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ ভারতমন্ত্রী (Secretary of State for India) ড্যুক্ অফ্ আর্গায়লের প্রতি ১৬ই

* Life & letters of F. Maxmuller.

আগষ্ট ১৮৬৮ সালে লিখিত ম্যাক্সমূলরের পত্র থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

"The ancient religion of India is doomed and if christianity does not step in, whose fault will it be?"*

অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন ধর্ম নষ্ট হবে, কিন্তু, যদি খৃষ্টধর্ম ঐ স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম না হয় তবে কাকে দোষী করা হবে? (অর্থাৎ এটি সরকারের দোষ বলে পরিগণিত হবে কারণ বিদ্বান ও বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আপন কার্য্য সম্পন্ন করেছে।)

ভারতীয় বিদ্বানগণ খৃষ্টান বিদ্বানদের জ্ঞান-বিদ্যার সেবক রূপে স্বীকার করে এদের বিশ্বাস করে নিতেন। মূল গ্রন্থের পাঠ ব্যতিরেকেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মান্যবর শ্রী বালগঙ্গাধর তিলক Antic Home in the Vedas নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিলক মহারাজ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ না করে, কেবল ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ও তারই উপর নির্ভর করে উক্ত মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই তথ্য তিনি শ্রী রমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্বীকার করেন। শ্রী বিদ্যারত্নজী পাঁচদিন ধরে আলোচনা ও বিচারের মাধ্যমে যখন তিলকজীকে তাঁর ভুলগুলির উপর আলোকপাত করান, তখন তিনি স্বীকার করেন যে তিনি সংস্কৃত মূল গ্রন্থ এবং বেদের মূল না পড়েই কেবল ইংরেজি অনুবাদই পাঠ করেছিলেন। ++

১। বিকাশবাদ অনুসারে মানবজাতি বানর থেকে বনমানুষ হয়েছে এবং বানর থেকে বিকশিত হয়ে মানব হয়েছে। বানর শুদ্ধ শাকাহারী প্রাণী, বনমানুষও শাকাহারী। প্রাচীন কালে ফলমূল বন প্রভৃতি অনেক বেশি ছিল, ধরণীতে ফলমূলের অতিরিক্ত বন্য অন্ন ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত, প্রাকৃতিক নিয়মেই সহজলভ্য ছিল।

"বাদী তোষন্যায়" এর দ্বারা যদি বিকাশবাদের চক্রকে মেনে নেওয়া হয়, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তখন ফলমূলের আধিক্য থাকায় আদিম কালের মানব গোষ্ঠীর মাংসাহারী হবার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। বানর মাংসাহারী নয় অথচ বানরের বিবর্ত্তনে মানুষ মাংসাহারী রূপে পরিণত হল। কেন? কি ভাবে?

২। মানবজাতি ভিন্ন, সমান প্রসবাত্মিকা জাতি : যে জাতির নর-নারী

---

* বেদো কা যথার্থ স্বরূপ পৃ-৩৩।

++ দেখুন—বৈদিক সম্পত্তি, প্রথম সংস্করণ, পৃ-৯৯।

সন্তানের জন্ম দাতা তারা একজাতি। কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ মাংসাহারী নয়। মাংসাহারী জীব ও মানুষের প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সেগুলি হল—

(ক) শাকাহারী প্রাণী ঠোঁট দিয়ে গণ্ডুস করে জল পান করে, মাংসাহারী জিভ দিয়ে চপ্ চপ্ শব্দ করে জলপান করে। মানুষ, গরু, মোষ প্রভৃতি মুখ দিয়ে গণ্ডুস করে জল পান করে। বাঘ, সিংহ, কুকুর, সাপ প্রভৃতি জিভ দিয়ে জল পান করে। অতএব মানুষ শাকাহারী।

(খ) শাকাহারী অন্ধকারে দেখতে পায়না, মাংসাহারী রাত্রেও দেখতে পায়। মানুষও রাত্রে দেখতে পায় না। বাঘ, সিংহ, বেড়াল আদি রাত্রে দেখতে পায়।

(গ) শাকাহারীর শরীরে ঘাম হয়, মাংসাহারীর শরীরে ঘাম হয় না। মাংসাহারী মুখ খুলে জিভ বার করে হাঁফায় এবং তাদের জিভ থেকে লালা ক্ষরণ হয়।

(ঘ) মাংসাহারী প্রাণীর সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়া, মৈথুনকালে বন্ধনের সৃষ্টি করে, কিন্তু শাকাহারীর মধ্যে তা হয় না।

(ঙ) মাংসাহারী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত ছোট হয়, সেখানে অধিক অম্ল নিঃসৃত হয়। মাংসের পচনকার্য্যের নিমিত্ত অধিক এ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য মাংসাহারে আসক্ত ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শাকাহারীর পচন প্রণালী (ক্ষুদ্রান্ত) বড় হয় এবং স্বল্প অম্ল নিঃসরণ করে।

(চ) মাংসাহারীর নখের ভিতর খালি হয় যা খাবার মধ্যে বন্ধ থাকে কিন্তু শাকাহারীর নখ সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

(ছ) মাংসাহারী প্রায়শঃ শাকাহারী পশুর মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করে, মাংসাহারীর মাংস নয়।

৩। যে সকল তথাকথিত বুদ্ধিবাদের দম্ভে দাম্ভিকেরা বেদকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার গ্রন্থরূপে স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করেন, তাদের কাছে এটিও একটি কারণ, ওদের মতানুসারে বেদসমূহের নির্মাণকারীগণ বনমানুষের সমীপবর্তী ছিলেন। সুতরাং বেদের মধ্যে বিদ্যা ও আদর্শের উন্নতমানের বক্তব্য থাকা সম্ভব নয়। Nearer the animal, lesser the wisdom.

বেদে গাভী সম্মান ও পূজার দৃষ্টিতে উপযোগী এবং অঘ্না রূপে স্বীকৃত। বেদে যজ্ঞের নাম অধ্বর। অর্থাৎ যে ক্রিয়া হিংসা রহিত। বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যাকারী আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন

যে—**"ধ্বরতীতি হিংসাকর্মা তত্প্রতিষেধঃ অধ্বরঃ"** যজ্ঞ কর্ম হিংসার বিরোধী। যজ্ঞকে সর্বথা হিংসা রহিতই হওয়া উচিত। গোমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি যে কোন প্রকার যজ্ঞে পশুবধের বিধান কোথাও পাওয়া যায় না। বেদে, বেদভক্ত জনগণের মনে তাদের বিচার কিংবা সংস্কারে, গোবধ অথবা গোমাংসের বিষয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই।

হাজার বছর ধরে বিদেশীদের সঙ্গে ভারতবাসীদের সম্পর্ক ও আচার-বিচার ব্যবহারের আদান প্রদান চলে আসছে। সময়ের গতির সঙ্গে দেশের কত মানুষ মাংসাহারী হয়েছেন। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে মাংসাহার কিংবা গোমাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা বা না করার কোন বাছ-বিচার নেই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে, আর্য সভ্যতার মধ্যে যাঁরা মাংসাহারী তারাও গোমাংস ভক্ষণকে পাপ ও অধর্ম বলে মনে করেন। গো-হত্যাকারীরা আর্য সংস্কৃতি নষ্ট করার হাজারো চেষ্টা করছে—বেদের ব্যাখ্যা দূষিত করেছে, গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপ-ভেজাল দেবার চেষ্টা করেছে; কর্মকাণ্ডের গ্রন্থ সমূহকে ভ্রষ্ট করেছে, কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেনি। **আজ পর্য্যন্ত আর্য বংশধরদের পরম্পরা—সংস্কার এবং বিচারকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। আজও ভারতের আর্য বংশধরেরা, বেদ ভক্ত হিন্দুরা গোধনকে পূজ্যা ও মাতা বলে স্বীকার করেন। জনগণের মনোভাব আজও নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক রয়েছে।**

গাভী এবং বেদ

বেদে গাভীকে শ্রদ্ধা সহকারে পালন ও সংরক্ষণ করার বিধান আছে।

ঋগ্বেদে গো হত্যা নিষেধ—

**মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং, স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায়, মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট।।**

ঋগ্বেদ০ ৮-১০-১-১৫

অর্থাৎ—

গাভী রুদ্রব্রহ্মচারী বিদ্বানগণের মাতা, নির্মাতা। দুষ্টের রোদনকর্তা (রোদয়তি তস্মাৎ রুদ্রঃ) বিদ্বান, সৈনিক, সেনাপতি ইত্যাদিগণ গাভীকে মাতৃতুল্য পুজনীয়া বলে মনে করেন। গাভী বসু বিদ্বানগণের পুত্রী। সমাজের সংস্থাপক (বাসয়ন্তি তস্মাৎ বসবঃ) ব্যবস্থাপক প্রবন্ধক আদির জন্য গাভী পুত্রী-সমা পালনীয়া, রক্ষণীয়া রূপে স্বীকৃত। গাভী অমৃতের

নাভি, অমৃতের কেন্দ্র। গোরক্ষার দ্বারা চিরজীবন সমাজচেতনা লাভ হয়। অতঃপর বেদ বিচারশীল, চিন্তনশীল পুরুষগণকে আদেশ প্রদান করে যে, 'গো' নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, অদিতি, অখণ্ডনীয়, অবধ্য সুতরাং তাকে হত্যা করো না। এটিই বেদের আদেশ এবং নির্দ্দেশ। This is mandatory—এটি ধর্মের আদেশ।

যজুর্বেদে গোহত্যা নিষেধ—

ইমং সাহস্রং শতধারমুৎসং ব্যচ্যমানং সরিরস্যমধ্যে।
ঘৃতং দুহানামদিতিং জনাযাগ্রে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্।।

যজ০১৩-৪৯

বেদে রাজার জন্য এই প্রকার উপদেশাত্মক মন্ত্র বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত মন্ত্রের অর্থ এই প্রকার—হে পরোপকারী রাজন্! গাভী মানুষের অসংখ্য সুখের সাধন, দুগ্ধের জন্য বিভিন্ন ভাবে পালনীয়া। গো, ঘৃত দুগ্ধ দাতৃ, অদিতি অখণ্ডনীয়া। হে মানব! একে হত্যা করো না। অর্থাৎ কেউই যেন গো হত্যা না করে—এ রকম রাজ্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত। This is mandatory for the state.

এই উপদেশের সরল তাৎপর্য থেকে এটি স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, আইনানুসারে রাজার আদেশদ্বারা গো হত্যা সর্বথা বন্ধ হওয়া উচিত।

অথর্ববেদে গোহত্যা নিষেধ—

"অন্যোন্যমভিহর্যৎ, বৎসংজাতমিবাঘ্ন্যা"

অথর্ব. ৩-৩০-১

এটি সামাজিক কর্ত্তব্যের উপদেশ—

হে মনুষ্যগণ! পরস্পর একে অপরকে এমনভাবে স্নেহ কর, ভালবাসো, যেমনভাবে অহন্তব্য গাভী আপন বাছুরকে ভালোবাসে।

মহাভারতে গোহত্যা নিষেধ—

অঘ্ন্যা ইতি গাবাং নাম, ক এতাহন্তুমর্হতি।
মহচ্চকারাকুশলং, বৃষং গাং বা লভেত যঃ।।

শান্তি০ ২৬২-৪৭

অর্থাৎ গাভীর অপর নাম অঘ্ন্যা, এরা অবধ্য। এই সকল গোহত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত। অথর্ববেদে গুলিবিদ্ধ করার বিধান—

অথর্ববেদের নিম্ন মন্ত্র লক্ষ্য করুন—

যদি নো গাং হংসি, যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তন্ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসি অবীরহা।।

অথর্ব. ১-১৬-৪

অর্থাৎ—যদি তুমি আমাদের গাভী সকল হত্যা করো, যদি আমাদের ঘোড়া এবং পুরুষদের হত্যা কর, তাহলে তোমাকে সীসের গুলি করে ধ্বংস করা হবে যাতে, তুমি আমাদের আর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে না পারো।

এতগুলো প্রমাণ তো এখানে একত্র করা হল, এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ একত্রিত করা সম্ভব। এই সকল প্রমাণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বৈদিক সাহিত্যে গোরক্ষার বিধান আছে, কোথাও গোহত্যার বিধান নেই। অনেক ক্ষেত্রে গোঘাতককে কঠোর দণ্ডদানের বিধানের উল্লেখও পাওয়া যায়।

যারা বলে যে বৈদিক পরম্পরায়, প্রাচীন ভারতে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, তারা নিশ্চয় কোন অন্তর্নিহিত স্বার্থ অথবা ভারতীয়তা কিংবা বৈদিক সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ কোন কপট চক্রান্তের শিকার।

সহস্র বৎসর যাবৎ বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। মহারাজা রঘু কিংবা শ্রী রামচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত আর্য সংস্কৃতি, আর্য আচরণ ও ব্যবহার সংসারে প্রকট ছিল। অসুর এবং আসুরিক সংস্কৃতি তখনও ছিল। কিন্তু অপ্রকট অবস্থায় ছিল। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তাদের প্রভুত্ব ঘটে। অনার্য আদর্শের মিশ্রণ হয়, আর্য গ্রন্থ ও স্মৃতি সমূহের মধ্যে ভেজাল দেওয়া শুরু হয়। মহাভারত যুগের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষের আর্য রাজা অনার্যদের মিশ্রণের শিকার হতে শুরু করেন। সুরা-সুন্দরী, মাংসের অল্পস্বল্প প্রবেশ হতে শুরু করে কিন্তু এ বিষয়ে সমাজের নেতা ও জনতার সুস্পষ্ট সাবধানতার ঘোষণা ছিল—

সুরামৎস্যাঃ পশোর্মাংসমাসবং কৃশরৌদনম্।
ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতদ্ নৈতদ্ বৈদেষু বিদ্যতে।।

শান্তি পর্ব০ ২৬৫/৯

ভারতবর্ষের ধর্মপ্রাণ জনতা রাম-কৃষ্ণের আদর্শের সম্মানকারীরা আজও গোহত্যা জঘন্য পাপ বলে মনে করে। গোহত্যাকারী সাংস্কৃতিক

ধারার দূষণকারীর অনুচিত প্রয়াস এবং পাপ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সুভাবনাসমূহ অদ্যবধি সুরক্ষিত রয়েছে। জনসাধারণের মনে গাভীর প্রতি অনুরাগ, গোমাংস ভক্ষণের প্রতি ঘৃণা এবং ক্ষোভ আজকের দিনেও পরিলক্ষিত হয়।

গোঘাতকদের আণবিক বোমা—

গো হিংসা সমর্থনকারীদের সব থেকে বড় অস্ত্র (১) **গোঘ্নোহতিথি ঃ** এবং (২) **গোমেধ যজ্ঞ**। আমাদের কাছে এটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কিভাবে অত্যন্ত চাতুরীর দ্বারা উপরোক্ত প্রয়োগ দুটি মাংসাহারের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গোঘ্নো অতিথি ঃ মহামুনি পাণিনির ন্যায় বৈয়াকরণ-এ পৃথিবীতে কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তাঁর সূত্র হল—

"দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" অষ্টা ০ ৩-৪-৭৩

এর সরল অর্থ হল—"দাশ ও গোঘ্ন" শব্দ দুটি সম্প্রদানে নিপাতনদ্বারা নিষ্পন্ন করা হয়।

গোঘ্নকে এই প্রকারে সম্প্রদান কারকে ব্যাখ্যা করা হয়।

"গৌর্হণ্যতে তস্মৈ গোঘ্নঃ" এই হণ্যতে শব্দের অর্থ মাংসাহারীরা এভাবে করেন, "হণ্যতে—হত্যা করা হয়"। **গৌর্হণ্যতে যস্মৈ বা তস্মৈ স গোঘ্নঃ**"। এই ব্যাখ্যাতে না আছে কোন ত্রুটি, না আছে মতভেদ। কিন্তু হণ্য শব্দটি কেবল হত্যার জন্যই ব্যবহৃত হয়না। হণ্যতের অর্থ গম্যতে। প্রাপ্যতে রূপেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ গৌর্হণ্যতে—গাভীকে প্রাপ্ত করানো হয় কিংবা দান করা হয়। সুতরাং কিভাবে?

এই ধাতুর অর্থ কেবল 'হত্যা' নয়, এর অর্থ 'গতি'ও হয়।

আচার্য পাণিনি ধাতুপাঠে 'হন্' ধাতুর পাঠও দিয়েছেন।

"হন হিংসাগত্যোঃ

অর্থাৎ হন্-এর প্রয়োগ দুপ্রকার অর্থে করা হয়—(১) হিংসা এবং (২) গতি। গতির অর্থও তিন প্রকারের—**"গতেস্ত্রয়োহর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চ**"। জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি। সুতরাং গৌর্হণ্যের অর্থ গৌর্গম্যতে অথবা গৌঃপ্রাপ্যতে। অতিথির নিকট গাভীকে প্রাপ্ত করানো হয়, অতএব একে সম্প্রদান বলা যায়, বধতো বলা যায় না। আরও একটি বাক্যের বিচার করা যাক—গোঘ্নো অতিথিঃ, এর প্রয়োগ দেখা যায়। যদি হন্যতের অর্থ হত্যা হয়, তাহলে গোহত্যা চণ্ডাল কিংবা অন্যান্য মাংসাহারীদের ক্ষেত্রেও হত্যা করা হবে। কিন্তু 'গোঘ্ন' অতিথির ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করা হয়, চণ্ডালাদির নিমিত্ত নয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাশিকাকার লিখছেন যে, চণ্ডালাদি গোঘ্ন নয়, গোঘ্নতো অতিথি।

"গোঘ্নো অতিথিঃ ন তু চণ্ডালাদিঃ"

অতএব গোঘ্নঃ শব্দের অর্থ হত্যা হবেনা, প্রদান, প্রাপ্ত করানোই হবে। হন্যতে-এর অর্থ বহু স্থানে গম্যতে-প্রপ্যতে হয়। মহাবৈয়াকরণ পাণিনির একটি সূত্র আছে—

"উপঘ্ন আশ্রয়ে" অষ্টা০ ৩/৩/৮৫

এর উদাহরণ হল—"পর্বতোপঘ্নঃ" ব্যাখ্যা—"পর্বতেনোপহন্যতে সমীপ্যেন গম্যতে" অর্থাৎ পর্বতের সমীপে যায়। এস্থানে এর অর্থ গমন। হন্ ধাতুর অন্যান্য গত্যর্থক প্রয়োগ আছে।

অথর্ববেদে হন্ ধাতুর গত্যর্থক প্রয়োগ নিম্নরূপ—

"যথাঙ্গবর্ধতাং শেপস্তেন যোষিতমিজ্জহি"

অথর্ব০ ৬-১০১-১

অর্থাৎ হে পুরুষ। তুমি পৌরুষ সম্পন্ন হয়ে আপন পত্নীর নিকট যাও (যোষিতম্+হত্+জহি)। এই জহি হন্ ধাতুরই রূপ এবং সকল ভাষ্যকারগণ এর অর্থ গচ্ছ=যাও এভাবেই বর্ণনা করেছেন। অতএব এর কেবলমাত্র একটি অর্থ হত্যাই নয়।

গোঘ্ন শব্দের বিচার—কোন বেদেই গোঘ্ন শব্দ অতিথি অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, সাহিত্য গ্রন্থেও বোধহয় কোথাও নেই। এটি বিদ্বানগণের অন্বেষণের প্রসঙ্গ যে গোঘ্নোহতিথিঃ—এর প্রয়োগ কোথায় করা হয়েছে? কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য আচার্য পাণিনি "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদান" সূত্রের দ্বারা 'নিপাতন' করেছেন। নিপাতনের অর্থই হল যে, সামান্য ব্যাকরণ থেকে সরে এসে আচার্য্য অপবাদ রূপে শব্দকে স্বীকার করেন।

গোঘ্ন শব্দের ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের মধ্যে প্রয়োগ সম্মত অর্থ আছে। **"গাং হন্তি অসৌ"** এই অর্থের প্রয়োগ বহু পাওয়া যায়। **কিন্তু সম্প্রদান কারকে, অতিথি অর্থে বৈদিক সংহিতায় এবং অন্য ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না।** অবশ্য গোহত্যাকারী অর্থে গোঘ্ন শব্দ বেদে এক আধ স্থানে পাওয়া যায় এবং লৌকিক সাহিত্যেও এর প্রয়োগ দেখা যায়।

বেদে হত্যাকারী অর্থে গোঘ্ন—ঋগ্বেদে নিম্ন পাঠ পাওয়া যায়—

"আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নম্" ঋগ্বেদ০ ১/২১৪/১

অর্থাৎ যে 'গোঘ্ন', গোহত্যাকারী এবং যে পুরুষঘ্ন সে মানব হত্যাকারী, তারা তোমাদের থেকে দূরে থাকুক। প্রয়োগ ও সাহচর্য্যের দ্বারা এ বিষয়টি এমনভাবে মনের মাঝে ধারণার সৃষ্টি করে যে, বৈদিক বর্ণনায় গোহত্যা মানব হত্যার সমান।

রামায়ণের মধ্যেও 'হত্যারা' অর্থে গোঘ্ন—

বাল্মীকি রামায়ণে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের একটি শ্লোকে 'গোঘ্ন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

"গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ, চৌরে ভগ্নব্রতে তথা"

কিষ্কিন্ধ ৩৪/১২

এখানে গোঘ্ন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গোহত্যাকারী, সুরাসক্ত, চোর ও ব্রতভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। হত্যাকারী অর্থে আরও অনেক শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যেতে পারে **কিন্তু অতিথি অর্থে গোঘ্ন শব্দের প্রয়োগ কোন বেদ কিংবা লৌকিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না।**

ইতিহাসে আতিথ্যের জন্য গোহত্যার কথা নেই—

বৈদিক এবং লৌকিক সাহিত্যের বিশাল ও সুবিস্তৃত ভাণ্ডার আছে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ আদি অন্যান্য অনেক উত্তমোত্তম গ্রন্থে হাজারো স্থানে অতিথি সৎকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ কোন অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য গোহত্যা করা হয়েছে এমন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য! 'উত্তর রামচরিতম্'-এর মধ্যে ভবভূতি পরিহাসাত্মক প্রসঙ্গ অবশ্য উপস্থিত করেছেন। অন্যথা, ঋষিগণ রাজাদের নিকট আসা যাওয়া করতেন। কিন্তু গো হত্যার বর্ণনা তো কোথাও পাওয়া যায়নি, উপরন্তু পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া গেছে।

বাইবেলের তৌরেতে আব্রাহিম ঈশ্বরের আতিথ্য করার সময় একটি মুলায়ম বাছুরের মাংস এবং রুটির আহার করিয়েছিলেন। এটি খৃষ্টান সংস্কৃতি। কিন্তু ভারতের সহস্র অতিথি সৎকারের বর্ণনায় কোথাও গোমাংসের বর্ণনা পাওয়া১যায় না। এই অনার্য সংস্কারগুলি আর্যগণের মধ্যে প্রচলিত করার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। কোন কথা-কাহিনীকে কোথায় কে কখন ধারণ করে, তার ঠিকানা কে রাখে। রাজা রন্তিদেবের কাহিনীও ঠিক ঐ প্রকার। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান পর্যন্ত আর্যদের প্রগাঢ় সম্বন্ধ তো ছিলই। কিন্তু আরও পশ্চিম আরব, ইউনানী

প্রভৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। এই সকল পশ্চিমী দেশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে ততটা পবিত্র ছিলনা। কিন্তু বৈদিক অথবা ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথি সৎকারের জন্য গোহত্যা কখনও স্বীকৃত হতে পারে না।

অতিথিগ্ব

কতিপয় বিদ্বান 'অতিথিগ্ব'-এর অর্থ করেন 'অতিথিগণকে গোমাংস পরিবেশনকারী। এ সকল ব্যক্তিদের বিচারে 'অতিথিগ্ব' এক প্রকার সম্মানসূচক উপাধি ছিল। এঁদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান শ্রী কনহৈয়ালাল মাণিকলাল মুন্সী হলেন প্রধান। শ্রী সায়ণাচার্য এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এর অর্থ লিখেছেন—

"অতিথীন্ প্রতি সেবার্থং গচ্ছন্" অর্থাৎ সেবা করার জন্য অতিথিগণের নিকট গমন করা। এখানে গোমাংসের কথা কোথা থেকে আসছে? ইউরোপীয় বিদ্বানেরাও 'অতিথিগ্ব' শব্দের অর্থ হিংসা অর্থে করেন নি।

প্রোফেসর মোনিয়র উইলিয়ম্ অতিথিগ্ব-র অর্থ করেছেন—'To whom guests should go' যার নিকট অতিথিগণ গমন করেন।

প্রোফেসর ব্লুমফীল্ড অতিথিগ্ব-র অর্থ করেছেন—'Presenting cows to guests. অতিথিদের গাভীরূপ উপহার প্রদানকারী, অর্থাৎ গোদাতা।

এই সকল প্রমাণ বিচার করার পর স্বীকার করতেই হয় যে সমাজের পরম্পরা থেকে উপলব্ধ ভাবনা, জনসাধারণের সংস্কার, যে কোনও পুস্তক থেকে অথবা যে কোন বিদ্বান ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ অপেক্ষাকৃত বলশালী। একদিকে যেমন, কিছু মাংসাহারী আছে অপরদিকে ঠিক তেমনই কিছু শুদ্ধ শাকাহারী রয়েছে। যারা মাংস আহার রূপে গ্রহণ করেন না, তাদের গোমাংসের প্রতি ঘৃণা অবশ্যই আছে কিন্তু মাংসাহারীদের মধ্যেও ৯৯% ভাগেরও অধিক ব্যক্তিগণ গোমাংস খাদ্যরূপে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন না। মাংসাহারী কিংবা শাকাহারী উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ গোমাংস ত্যাজ্য বলে মনে করেন এবং গো-কে মাতৃতুল্য পূজনীয় বলে স্বীকার করেন।

"গবো বিশ্বস্যমাতরঃ" গাভী বিশ্বের মাতা।

গোমেধ যজ্ঞ

বেদ সংহিতায় ২০০০০-এর অধিক মন্ত্র আছে, কিন্তু কোথাও গোমেধ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়না। অবশ্য কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ বিধানসমূহের মধে গোমেধ এবং অশ্বমেধের বর্ণনা পাওয়া যায়।

অশ্বমেধ এবং গোমেধ এদুটি এমন যজ্ঞ যে, যার সঙ্গে পশুহত্যার বিষয়কে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কোন রাজা অথবা ঋষি গোমেধ যজ্ঞ করেছেন এমন কোন প্রমাণ রামায়ণ—মহাভারত আদি ইতিহাস গ্রন্থে কিংবা রঘুবংশ ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্যে পরিলক্ষিত হয়না। অবশ্য প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। মধ্যকালে বেদজ্ঞানে অজ্ঞ কর্মকাণ্ডী সাম্প্রদায়িগণ অশ্বমেধ-এর সঙ্গে পশুবধ যুক্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা মহীধরাচার্যের ন্যায় তান্ত্রিক বামমার্গী আচার্যের সাহায্য পেয়েছিলেন। রামায়ণ থেকে শুরু করে মহাভারত পর্যন্ত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু যজ্ঞ কুণ্ডে কোন ঘোড়ার আহুতি প্রদান কোন আর্য রাজার দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। রাক্ষসদের কথা অবশ্য ভিন্ন ছিল। মাংস ভক্ষণ এবং চর্বির আহুতি প্রদান করা ছিল রাক্ষসী আচরণ।

অশ্বমেধ যজ্ঞতো রাষ্ট্রের সংগঠন। শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

(১) **রাষ্ট্রং বৈ অশ্বমেধঃ,** রাষ্ট্রই অশ্বমেধ।

(২) **তস্মাদ রাষ্ট্রী অশ্বমেধেন যজেত**, অতএব রাষ্ট্রবাদীর অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিৎ।

(৩) **'অশ্বমেধ যাজী সর্ব দিশো অভি জয়ন্তি'**, অশ্বমেধকারী সকল দিক জয় করেন।

শ্রীরামের পূর্বজ রঘু অশ্বমেধ করেন। শ্রীরামও অশ্বমেধ করেন, যুধিষ্ঠিরও করেছিলেন। যে কোন চক্রবর্ত্তী সম্রাট যিনি রাষ্ট্রের সংগঠন করেছেন, তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন। রাজার ঐশ্বর্য্য ও বর্চস্বের প্রতীক ঘোড়া সকল দিকে পরিক্রমা করে আসত। ঐ ঘোড়াকে হত্যা করে টুকরো করে কখনও তো কেউ আহুতি দেয়নি। মহীধরাচার্য একজন তান্ত্রিক আচার্য ছিলেন। তিনি বেদমন্ত্রকে ভেঙ্গে-চুরে অন্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সায়ণাচার্য মহীধরাচার্য এঁরা ঋষি যুগের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন। ততক্ষণে বিদেশী সংস্কৃতি-সমূহের মিল-মিশ হওয়ার অনেক সুযোগ এসে গেছে। পশুহিংসা বিদেশী সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল। যা বেদ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের মধ্যে বিদেশী

শাস্ত্রের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। বেদ যজ্ঞকে অধ্বর বলে অভিহিত করে। নিরুক্তের সর্বমান্য আচার্য যাস্ক অধ্বরের ব্যাখ্যা করেছেন—"**ধ্বরতীতি হিংসা কর্মা, তৎপ্রতিষেধঃ অধ্বরঃ**" হিংসার ত্যাগ হল অধ্বর। বেদে অনেক স্থানে যজ্ঞের জন্য অধ্বর শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব বেদে ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি যে কোন পশুহিংসার আদেশ কিংবা বিধান নেই।

এখানে আমরা গোমেধ যজ্ঞের বিষয়ে আলোচনা করছি। 'গোমেধ যজ্ঞ' তিনটি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। (১) গো, (২) মেধ ও (৩) যজ্ঞ। এই তিন শব্দের প্রথম শব্দের বিবেচনা করা উচিত।

গো ঃ গরু চতুষ্পদ দুগ্ধ-প্রদানকারী পশু। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে "গো"-এর অনেক অর্থ হয় এবং সকল প্রকার অর্থই সাহিত্যে এবং সমাজের মধ্যে সুলভ প্রয়োগ পাওয়া যায়। হলযুধ সংস্কৃত কোষে একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

> **"দিগ্‌দৃষ্টি দীধিতস্বর্গবজ্র বাগ্বাণবারিষু।**
> **ভূমৌ পশৌ চ গো শব্দো বিদ্বদ্ভির্দশসু স্মৃতঃ।।"**

হলা ০ অভিধান ০ কা০ ৫-৬

অর্থাৎ—বিদ্বানগণ গো শব্দের দশ প্রকার অর্থ করেন। ১) দিশা, ২) দৃষ্টি, ৩) দীধিতি = কিরণ, ৪) স্বর্গ, ৫) বজ্র, ৬) বাক্ = বাণী, ৭) বাণ = তীর, ৮) বারি = জল, ৯) ভূমি, ১০) পশু (গো নামক পশু)।

গোমেধ যজ্ঞে বাক্ = বাণী এবং ভূমি = পৃথিবীর পরম্পরা অনুযায়ী প্রয়োগ পাওয়া যায়। অন্য প্রয়োগও হতে পারে।

গৌ-এর এই অর্থ বৈদিক কোষ 'নিঘন্টু' দ্বারা সমর্থিত। যাস্কাচার্য নিঘন্টুর ব্যাখ্যা তিনি তার নিরুক্তে লিখেছেন—

১) '**গৌঃ**' ইতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্

(ক) **যদ্ দূরংগতা ভবতি**; পৃথিবী দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাই গৌ (পৃথু বিস্তারে)

(খ) **যচ্চ অস্যাং ভূতানি গচ্ছন্তি**—এর উপর আরূঢ় হয়ে প্রাণী অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করে।

২) '**গৌঃ মাধ্যমিকা বাণী**—শাস্ত্রে বাণীর ভেদ চার প্রকার, (১) পরা, (২) পশ্যন্তি, (৩) মধ্যমা, (৪) বৈখরী। এর মধ্যে মধ্যমা বাণীর নাম গৌ।

(ক) **"গৌঃ এতস্যা মাধ্যমিকায়াঃ বাচঃ"** (অ ০ ৬)

(খ) **'গৌঃ বাগেষা মাধ্যমিকা"** (অ০ ১১ খ ০৪২)

সুতরাং গো-এর দুটি অর্থ আমরা গ্রহণ করছি।

(১) গো = পৃথিবী, এবং (২) গো = বাণী।

মেধ—মেধ-এর তিন প্রকার অর্থ ধাতুপাঠ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১) মেধ থেকে মেধা, মেধাবিন্, "যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। এস্থানে মেধা = বুদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদি।

২) মেধের সংগমন, সমন্বয়, সংগতিকরণ আদি অর্থও হয়।

৩) মেধের অর্থ হিংসাও হয় কিন্তু এর প্রয়োগ বিরল, হিংসা অর্থে প্রয়োগ অত্যন্ত কম।

যজ্ঞ—যজ্ঞ শব্দ যজ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়। এরও তিনটি অর্থ আছে—

১) দেবীপূজা (পূজনন্নাম সৎকারঃ)

২) সংগতিকরণ অর্থাৎ কোন বস্তুর সমন্বয়-সামঞ্জস্য-সংস্কার দ্বারা তাঁকে অধিক উপযোগী করা।

৩) দান করা।

শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "অন্নং হি গৌঃ লিখিত আছে। আজ থেকে প্রায় সোয়া শত বৎসর পূর্বে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ নিজ অদ্বিতীয় ধর্ম-মীমাংসার গ্রন্থ সত্যার্থপ্রকাশে সর্বপ্রথম উক্ত পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান। সুতরাং খড়কুটোর বেড়ার আড়ালে থাকা পর্বত প্রকাশ্যে এলো। এখন গো+মেধ+যজ্ঞ এই তিন শব্দ একত্রিত করলে বিষয়টা সহজ বোধগম্য হয় যে, **পৃথিবীকে উর্বর করে অন্নউৎপন্ন করা গোমেধ যজ্ঞ**। ভারতীয় পরম্পরায় গোদান এবং গোচারণ ভূমির দান বহুবার একই সঙ্গে সম্পাদিত হত। শ্রী রঘুলাল শর্মা তাঁর নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৈদিক সম্পত্তিতে লিখেছেন—(বৈদিক সম্পত্তি পৃ. ৩০৪)

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ যুগীয় গ্রন্থের উল্লেখ থেকে T. W. Phys Davis, L.L.D., Ph.D. আপন পুস্তকে লিখেছেন যে পশুচারণ ভূমি ও জঙ্গল বিষয়ে অধিক ধ্যান দেওয়া হত। পুরোহিত সর্বদা এই বিষয়ের প্রতি দাবি রাখতেন যে যজ্ঞাদির পরিবর্তে তাঁর ঐ প্রকার ভূমির প্রাপ্তি হোক। দানপত্র লেখার সময় এ বিষয়ে বিশেষ ধ্যান রাখা হত যে, ঐ প্রকার এক আধ পশুচারণ ভূমি অথবা জঙ্গলের কথা যেন ঐ পত্রে উল্লেখ থাকে। ডেভিস-এর ইংরেজি উদ্ধৃতি—

"Great importance was attached to these rights of pastures and forestry. The priest claimed to be able, as one result of performing a particular sacrifi e to ensure that a wide tract such land should be prc ׳ided (Sat-13.37), and it is often made a special point, in describing the grant of a village to a priest, that it contains such common lands." *

গোমেধ যজ্ঞ ব্যবস্থায় ধার্মিক কর্মকাণ্ড একটি শব্দ রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে। বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রের ভাষায় Land Reclamation ভূমিকে কৃষিযোগ্য করে গড়ে তোলা বোঝায়। স্বামী দয়ানন্দজী তো সোয়াশত বৎসর পূর্বেই গোমেধ শব্দের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করেছিলেন। তিনি "অন্নং হি গৌঃ" শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণের উদ্ধৃতি দিয়ে এর সম্বন্ধ কৃষি ও অন্ন উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এদিকে পারসীদের পবিত্র পুস্তক সমূহের অধ্যয়নের মাধ্যমে ডাঃ মার্টিন হাগ বলেন যে, গোমেধ-এর অর্থ গোবধ নয়। পক্ষান্তরে, এর অর্থ—ভূমিকে উর্বর করে বনস্পতি উৎপন্নযোগ্য করা। তিনি এ ধরণের কল্পনাই শুধু করেন নি, পরন্তু আবেস্তা ভাষা দ্বারা গোমেধ-এর অপভ্রংশ "গোমেজ" (Gomez) শব্দ অন্বেষণ করে উপস্থিত করেন। এই শব্দের দ্বারা "গোমেধ" শব্দের উপর অত্যন্ত উত্তম প্রভাব বিস্তার করে।

ডাঃ হাগ লিখছেন, "পারসী ধর্মে কৃষিকার্য ধর্ম বলে মনে করা হয়। অতএব কৃষি-ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষাকারী সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নাম 'গোমেজ'—"The Parsi religion enjoins agriculture as religious duty and this is the whole meaning of Gomez" (From Essays on the Sacred Language—Writings and Religion).++

আমরা সংস্কৃতের হলায়ুধ কোষ এবং যাস্কাচার্যের নিরুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে এটাই দেখিয়েছি যে গো শব্দের অনেক অর্থের মধে বাণীও একটি অর্থ। কয়েকজন আচার্য মধ্যমাবাণীর সংজ্ঞা গোশব্দ রূপে বর্ণনা করেছেন। মেধের অর্থ সংগমন এবং যজ্ঞের অর্থ সংগতিকরণই হয়। সুতরাং 'গোমেধ'-এর অর্থ হবে বাণীর অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সংগমন-সংগতিকরণ। আত্মা থেকে 'পরা' বাণী মনের সংকল্পের দ্বারা 'পশ্যন্তী'

* The Stories of the Nation, Buddhist India—T. W. Rhys Davis Dialogue of Buddha. ++ বেদোঁ কা যথার্থ স্বরূপ—আচার্য ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড পৃ-২৯২।

রূপ নিয়ে উচ্চারণের পূর্বে 'মধ্যমা' রূপ দ্বারা বৈখরী বাণীকে প্রস্ফুটিত করে। এই সামঞ্জস্য, সংগতিকরণ ভাষাকে, বাণীকে প্রভাবশালী করে তোলে।

মহর্ষি গার্গ্যায়ণ কৃত প্রণববাদে গোমেধ যজ্ঞের ব্যাখ্যা নিম্নরূপে পাওয়া যায়—

"গোমেধস্তাবচ্ছব্দমেধ (শব্দ+মেধ) ইত্যবগম্যতে, গাং বাণীং মেধয়া সংয়োজনমিতি তদর্থাৎ। শব্দশাস্ত্র জ্ঞানমাত্রস্য সর্বেভ্যঃ প্রদানমেব গোমেধো যজ্ঞঃ" (প্রণববাদ-প্রকরণ ৩, তরঙ্গ ৬) অর্থাৎ বাণীকে মেধার সঙ্গে সংযুক্ত করা, অন্য সকল ব্যক্তিকে শব্দ শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ ব্যাকরণ পড়ানো = গোমেধ যজ্ঞ করা।

বেদ শাস্ত্র, ঋষি পরম্পরায় সত্যনিষ্ঠা দ্বারা বিচার করা হলে মাংস, মদ্য গোবধ ইত্যাদির কোন প্রকার রূপ পাওয়া যায় না। ঠিক এই কারণবশতঃ আজও আর্য হিন্দুদের মধ্যে এই সকল বিষয় ঘৃণার বস্তু এবং কদাচার হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আলোচ্য বিষয় আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সব কিছুই প্রমাণ নয়। সত্যযুগের সময়ে সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও, ত্রেতায় বিশেষভাবে মহারাজ রঘুর সময় থেকে আসুরী সংস্কৃতির আদান প্রদান সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রাবণ অহিরাবণ আদির পূর্বেও আসুরিক আচার বিচারের মিশ্রণ হতে থাকে। অসুরদের যাগ যজ্ঞে রক্ত মাংসের প্রচলন তো ছিলই উপরন্তু যখন আসুরিক সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত আচার্য্যগণ গভীর ভাবে মিশ্রণের প্রভাবকে গ্রহণ করতে শুরু করেন তখন মহর্ষি ব্যাস, পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি প্রতিটি মানুষকে সাবধান করানোর বিষয়টি অনুভব করেন যে, বেদে মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানের উল্লেখ নেই।

সুরা মৎস্যাঃ মধু মাংসমাসবং কৃশরৌদনম্।
ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং যজ্ঞে নৈতদ বেদেষু বিদ্যতে।।

শান্তি পর্ব-২৬৫-৯

অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস ইত্যাদি যজ্ঞে প্রদান করার প্রচলন ধূর্তগণের প্রচার, এই প্রকার বিধান বেদের কোথাও পাওয়া যায়না।

বিপরীতভাবে মুসলমানযুগে আজ থেকে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে এবং ঋষি-মুনিদের পরম্পরা সমাপ্ত হবার বহু পরে সায়ণাচার্য উব্বটাচার্য, মহীধরের বেদ ভাষ্য রচিত হয়, যার মধ্যে বেদ এবং ঋষি পরম্পরার

বিরুদ্ধে পশুবধ আদির বর্ণনা পাওয়া যায়, যদ্যপি ঋষি-পরম্পরার মধ্যে এসকল প্রমাণ নেই।

দ্বাপরের শেষকালে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। জরাসন্ধের জামাতা কংস বেদ ব্রাহ্মণ, গাভী, যজ্ঞ এদের সকলকে নষ্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবৎ-এর একটি শ্লোক বিচার্য—

তস্মাৎসর্বাৎমনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হম্মো হবির্দুঘা।।

দশম-৪-৪০

কংসকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে বেদপাঠী, বেদোপদেশক, যজ্ঞের যাচক যজমান, তপস্বী-ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় দুগ্ধ-ঘৃত প্রদানকারী গাভীগণের হত্যা করার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করা হোক।

মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ে বেদ-বাণী, বেদ প্রচারক ব্রাহ্মণগণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং পশ্চিমের আসুরী সংস্কৃতির মিশ্রণ হতে থাকে। মুসলমান যুগে বৈদিক গ্রন্থ নষ্ট করা হয় এবং তীব্রভাবে ইস্লামী মিশ্রণ করা হয়। অল্লোপনিষদ্ রচিত হল এবং এটি অথর্ববেদের শাখা বলে বর্ণনা করা হল। সেখানে আল্লাকে পরমেশ্বর রূপে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হল।

অল্লো জেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণম্ অল্লাম। ।।২।।
অল্লো রসুল মহামদঃ অকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ।।৩।।
অল্লা ঋষীণাং সর্ব দিব্যাং .... ।।৬।।
ওম্ অল্লা ইল্লাল্লা অনাদি স্বরূপায় অথর্ব০ ।।
.... অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্ ।।৯।।
.... অল্লো রসূল মহমদ অকবরস্য অল্লো অল্লাম্
ইল্লল্লেতি ইল্‌ল্লাঃ ।।১০।।

যখন স্বামী দয়ানন্দজী এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে অথর্ববেদে কোথায় এর বর্ণনা আছে একথা জানতে চেয়ে দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন তখন এই প্রকার ষড়যন্ত্রে ইতি পড়ল। পীর পয়গম্বর দরবেশ, মাজার, গাজী মিঞার চোগা-চাপকান ইত্যাদির পূজা শুরু হল এবং আর্য সমাজ জাতি ধর্ম জাগরণের জন্য এর বিরোধ করল, ফলস্বরূপ আর্য সমাজকে সাম্প্রদায়িক, দ্বন্দ্বপ্রিয় অসহিষ্ণু এবং আরও অনেক কিছু বলা হতে লাগল। কিন্তু—

জ্যোঁ শ্বান ভূকতে হ্যায় খড়ে, হাতি জাতা হ্যায় চলা,
ক্যা মশকোঁ কী হুংকার সে, খগপতি ডরতা হ্যায় ভলা?

গান্ধীজী একদা আর্যসমাজের আলোচনা করায় সকলে অবাক হয়েছিলেন কিন্তু দেশজাতীর রক্ষক ঐ পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনায় নিরুৎসাহী হননি।

ইসলামী যুগ ছিল বর্বর নিষ্ঠুর। খৃষ্টান যুগের আগমনে বিদ্যাও উন্নত হয়। পরিচ্ছন্ন কায়দায় রাষ্ট্রদ্রোহী খৃষ্টানগণ সভ্যতার জামা পরে উপস্থিত হন। ভারতীয় বিচার ও চিন্তাধারায় মিশনারীগণ আক্রমণ করেন। বিদ্যা, ইতিহাস ও মান্যতার ক্ষেত্রে ছল কপটতা চলতে থাকে। পুরা বিদ্যা, ভারতীয় বিদ্যা, ঐতিহাসিক তথ্য সমূহকে খৃষ্টানগণ ভেঙ্গে চুরে পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেন। তাঁরা বলতে শুরু করেন, আর্যগণ আক্রমণকারী, সিন্ধু সভ্যতা অনার্যদের, হিন্দু দ্রাবিড়, ভিন্ন। ভারতীয় পরম্পরার ইতিহাসের উপেক্ষা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, সংস্কৃত বিদ্যার রূপ বিকৃত করা ইত্যাদি ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ইংরেজদের দ্বারা নতুন ভাবে ইতিহাস লেখানো হয়। নতুন নতুন অভারতীয় মান্যতার সংযোজন হয়। ওদের সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজবাদী। সাম্যবাদী ইত্যাদি বরুবাদী। ভারতীয় পরম্পরার বিদ্বানগণের উপেক্ষা এবং ইংরেজ মনোভাবাপন্ন দাসেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক পদে নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়েও পরম্পরা প্রাপ্ত ভারতীয়তা বিরোধী কার্যের গড় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বান নির্মাণ কার্য্য চলতে থাকল।

যে যত উগ্রতার মাধ্যমে ভারতীয়তার বিরোধ করতে সক্ষম তাকে ততই উচ্চ আসন এবং সারস্বত পুরস্কার প্রদান করা হত। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করাই ছিল ইংরেজদের স্বার্থ। খৃষ্ট ও খৃষ্টীয়তা ছিল একমাত্র হাতিয়ার

অল্লোপনিষদের ন্যায় খৃষ্টোপনিষদ্‌ও রচিত হয়েছিল। একটি প্রচলিত শ্লোক—

"নরকুল কুলষঘ্নো মোক্ষদঃ প্রেম মূর্তিঃ।
বিজিত নরক রাজ্যঃ স্বর্গরাজ্যৈক মার্গঃ।।
সকল ভুবন ভর্ত্তা পাতু নঃ খ্রীষ্টযীশুঃ।।"

এ সকল হিন্দুদের খৃষ্টান করার নীতি ছিল। যীশুকে পরমেশ্বরের রূপে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকের মাধ্যমে স্তুতি প্রার্থনা করা থেকে অন্তর্নিহিত উদ্দ্যেশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

শোধ-এর নামে

ইংরেজদের আগমনের পরবর্ত্তী সময়ে যখন ইংরেজ প্রভুত্বে প্রভাবান্বিত বিশ্ববিদ্যালয়েগুলির মান্যতা নির্দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহাস্পদতা-রহিত বলে মনে করা হতে শুরু করল তখনই সাহিত্য ও গ্রন্থ রচনার নতুন বিধানের সূত্রপাত হল। এর নামকরণ হল শোধ। শোধ (Research) "রিসার্চের" অর্থ পুনরায় খোঁজ করা। কোন বস্তু সঠিকভাবে ছিল, কিন্তু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, কোন প্রকার আবরণের মধ্যে ঢাকা পড়েছে, পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে সুতরাং এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না—তার খোজ করা (সার্চ করা)। শোধ-এর অর্থতো শুদ্ধ করা। কোন বস্তুতে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত মিশ্রণ হলে তাকে নির্মল করা শোধ কিংবা শোধন করা বোঝায়। রিসার্চ এবং শোধ পরম্পরা অর্থ থেকে পৃথক হয়ে বর্ত্তমানে এক নতুন অর্থের প্রচলন শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষে পরম্পরা অনুযায়ী তিন প্রকারের গ্রন্থলেখনের প্রচার দেখা যায়।

১) প্রোক্তা গ্রন্থ—শিষ্যদের ব্যাখ্যা করার জন্য কিংবা উপদেশ প্রদান করার জন্য আচার্য বক্তব্য রাখতেন, শিষ্য সেই কথন হৃদয়ঙ্গম করতেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে বিদ্যার বিচারকে সুরক্ষিত রাখতে আচার্যের নাম লিপিবদ্ধ করা হত। যেমন মনুস্মৃতি। এটি প্রোক্তা, কৃত নয়। মনুরব্রবীৎ—মনুনাপরিকীর্তিত ঃ যেমন অনেকানেক প্রয়োগ বলছে যে, মনুস্মৃতি প্রোক্তা গ্রন্থ, কৃত নয়।

২) কৃত গ্রন্থ—এই প্রকারের গ্রন্থ সমূহের গ্রন্থকার স্বয়ং লিখতেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা লেখাতেন যথা—মহামনি পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ গ্রন্থ অথবা ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ আদি দর্শনের সূত্র গ্রন্থ।

৩) ভাষ্য অথবা ব্যাখ্যা গ্রন্থ—অষ্টাধ্যায়ী আচার্য পাণিনি কৃত গ্রন্থ এবং অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার হলেন আচার্য পতঞ্জলি, এই ভাষ্য মহাভাষ্য বলে পরিচিত। পতঞ্জলি ঋষি যোগদর্শনের রচয়িতা এবং ব্যাস ঋষি ঐ যোগদর্শনের ভাষ্যকার। (যোগদর্শনের রচয়িতা পতঞ্জলি ঋষি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋষি ভিন্ন এবং এর থেকে বহু প্রাচীন।)

গ্রন্থ লেখনের চতুর্থ প্রকারটি অর্থাৎ শোধ (Research) গ্রন্থ ইংরেজদের আগমনের পরবর্ত্তী সময়ে বিকাশ লাভ করেছে। আমরা এই সম্বন্ধে কোন প্রকার টীকা টিপ্পনী না করে কেবল এটুকু বলতে চাই যে অতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গুণবত্তা অন্যান্য প্রকারগুলির স্তরের দৃষ্টিতে

এই প্রকারটির অধোগমন শীঘ্রই এসে পড়েছে। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বাস্তবিক রূপে শোধকার্য্য অতিবিরল হয়ে পড়ে।

শোধ এর দৃষ্টিতে ভারতীয় পরম্পরাকে বিকৃত রূপে প্রস্তুত করা, ইতিহাসকে বিকৃত করে ভিন্নভাবে বর্ণনা করাকে শোধ বলে স্বীকার করা হচ্ছে। এইরূপ শোধকর্ত্তা নামধারী বিদ্বান মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। এই ধরনের বিদ্বান অপরের লিখিত নিষ্কর্ষ দ্বারা আপন শোধ-এর মহল নির্মাণ করেন।

আমরা এখানে "গোবধ" এবং "গোমাংস ভক্ষণ" বিষয়ের আলোচনা করছিলাম। শতপথের তৈত্তরীয় আরণ্যকে একটি প্রমাণ আছে—**"অন্নং বৈ গৌঃ"**

এতেই বিদ্বানদের ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে গেল। অর্থ করে লেখা হল—"গো অন্ন, অতএব খাদ্য। ব্যাস, পূর্বগ্রহগ্রস্থদের আর কী প্রয়োজন ছিল? এধরনের বিদ্বানগণ **অন্নং বৈ গৌঃ** এবং **গৌর্বৈ অন্নম্** বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করেন না। এদের মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয়র প্রতি মনযোগ নেই। হিন্দীর মধ্যে একটা প্রয়োগ লক্ষ্য করুন—

যারা "রানী শেরনী হ্যায়" ও "শেরনী রানী হ্যায়" এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং যারা নিজ পূর্বাগ্রহের কারণে ভারতীয় ঋষিমুনির পরম্পরায় অনুচিত নিষ্কর্ষ সন্ধান করে ও নিজেদের সম্পূর্ণ বিদ্বান বলে জাহির করে তাদের থেকে বড় কপট আর কে আছে? এ ধরণের গবেষক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে পুরস্কৃত হন। ইংরেজ অনুপ্রাণিত শিক্ষানীতির ফল এইরূপ—"অন্ধের নগরী চৌপট রাজা" আজ পর্য্যন্ত এভাবেই চলে আসছে। কে জানে কখনো বাস্তবিক শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে কিনা, কিংবা এভাবেই চলতে থাকবে। যারা "অন্নং বৈ গৌঃ" ও "গৌর্বৈ অন্নম্" এর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম তারাই আবার বেদশাস্ত্র ইতিহাসের নির্ণয় করতে উদ্যত হয়।

"অন্নং বৈ গৌঃ" কথার অর্থ কি? এর তাৎপর্য কি? অন্নম্ উদ্দেশ্য (Subject) গৌঃ বিধেয় (Predicate)। অন্নের বিশেষতার পূরক 'গৌঃ'। অর্থাৎ গরু হল অন্ন। এর দ্বারা কোন প্রকার অর্থ প্রতিপন্ন হয়?

আমরা একটি সমানান্তর প্রয়োগ করেছি—রানী শেরনী। রানী উদ্দেশ্য, শেরনী বিধেয়। এর অর্থ হল রানী শেরনীর ন্যায়। অর্থাৎ রানী শেরনীর মত চতুষ্পদ পশু কিংবা শিকারী পশু হয়ে যায় না, বরঞ্চ শেরনীর ন্যায় বীর বাহাদুর, প্রসন্ন আক্রমক হয়ে উঠে। রানীর মধ্যে শেরনীর কিছু গুণধর্মের আরোপ করাই বক্তার অভিপ্রায়।

এখানে **"অন্নং বৈ গৌঃ"** প্রয়োগের মাধ্যমে গরুর কিছু গুণধর্মের আরোপ অন্নের মধ্যে করানোই অভিষ্ট। গাভী আমাদের পালন করে। আবার অন্নও আমাদের পালন করে। গাভী আমাদের জন্য সংরক্ষণীয়া। সম্বর্ধনীয়া, ঐ ভাবেই অন্নও সংরক্ষণীয়—সম্বর্ধনীয়। "অঃ : বৈ গৌঃ" অন্ন গাভী অর্থাৎ পালনকর্তা, সংরক্ষণ সম্বর্ধন ইত্যাদি নাকি গরু অন্নের ন্যায় খাদ্য। এই প্রকার অর্থ ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অন্যায় বলে পরিগণিত হবে।

মনুর মতে মাংসে নিষেধ

মনু মাংস ভক্ষণের ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু একজন শোধ বিদ্বান (Research Scholer) এ ধরনের সাহস দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না যে—মনু মাংসকে খাদ্য বলে স্বীকার করতে নিষেধ করেছেন। মনুস্মৃতির বহু প্রমাণ অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু ইনি তো এমন একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিদ্বান যিনি মূল গ্রন্থ দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। এ বিষয়ে দু একটা উদাহরণ দেখুন—

"নাহকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা, মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বার্থস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ।।
সমুৎপত্তিং চ মাংসস্য, বধ বন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত, সর্বমাংসস্য ভক্ষণাদ্।।

(মনু. ৫-৪৮-৪৯)

অর্থাৎ প্রাণীহিংসা ব্যতীত মাংস পাওয়া সম্ভব নয় এবং প্রাণীবধ দুঃখদায়ী, অতএব মাংস ভক্ষণ বর্জনীয়। মাংস প্রাপ্তি এবং পশুহত্যার বিষয়ে বিবেচনা সাপেক্ষে সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ বর্জন করা উচিত।

স্ব মাংসং পর মাংসেন, যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তিক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ, স নৃশংস তরোনরঃ।।

(মহা০ অনু০ ১১৬-১১৭)

অর্থাৎ অপরের মাংসের দ্বারা যে নিজ শরীরের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় সে অত্যন্ত নীচ এবং নিষ্ঠুর (মানুষ) বলে বিবেচিত।

অগ্নি এবং ইন্দ্রের মাংস-প্রিয়তা—কোন এক বিদ্বান গল্পের ফানুস ওড়ান যে, ইন্দ্র প্রভৃতির নিকট মাংস প্রিয়। বেদে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি পরমেশ্বরের নাম। তবু ভাল, পাশ্চাত্যদের অনুগামীরা

পরমেশ্বরকে মাংসাহারী বলে অভিহিত করেন নি। বেদে পরমেশ্বর ও মানুষেরা মধ্যে না আছে কোন পয়গম্বর অথবা মসীহা এবং না কোন চেতন দেব-মণ্ডলী।

অবশ্য, মন্ত্র সমূহের দেবতা আছে। কিন্তু তার তো পরিষ্কার পরিভাষাও আছে। "যা তেনোচ্যতে সা দেবতা"—ঋচার অন্তর্গত সকল মন্ত্রের বিষয়বস্তুই হয় দেবতা। আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন—

"দেবো দানাৎ, দীপনাৎ, দ্যোতনাৎ, দ্যুঃস্থানে ভবতীতি বা"।

অর্থাৎ দেবতা হয় দান করেন, নয় দীপন করেন, অথবা দ্যোতন করেন কিংবা দ্যুলোকে থাকেন, যেমন—সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ। মাংস প্রেমী যে সকল দেবতা পশুবলি সমর্থন করেন তারা সেমেটিক ধর্ম পরম্পরার প্রতীক বলে পরিগণিত। বেদ এবং ঋষিদের মান্যতার মধ্যে এধরণের অপসিদ্ধান্ত নেই। অবশ্য, ইউনানীতে এই পরম্পরা ছিল, ভারতের অসুর রাক্ষসদের মধ্যেও তা ছিল, কিন্তু আর্যদের মধ্যে ছিলনা। একে আর্যদের মস্তকমুণ্ডনরূপ শোধ অথবা রিসার্চ নয়, অন্যায়। অবশ্য, কৃত বিদ্যা, বিক্রীত বিদ্বান, পুর্বগ্রহগ্রস্থ ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র। বোধহয়, এইজন্য মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি অধিকাংশ সময়ে দেওয়া হয় না। এই সকল বিদ্বান মূলগ্রন্থের মৌলিক ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে থাকতেন। বেদে ২০,০০০-এর অধিক মন্ত্র আছে। এগুলি মণ্ডল, অধ্যায়, বর্গ, সূক্ত ও অনেক প্রকারের বিভাগে আপন-আপন বিষয় অনুসারে বিভক্ত। যে কোন মন্ত্রের অর্থ তো তার সন্দর্ভের মধ্যেই থাকবে, সন্দর্ভ বহির্ভূত অর্থ তো অনর্থ।

আরেকটি আপত্তিজনক শোধ

এটি সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে আর্য হিন্দু জনমানস অহিংসার পক্ষে এবং মাংসাহারের সমর্থক নয়। বিশেষ করে গোমাংসের অতি প্রবল বিরোধী। এই সকল শোধ নামধারী বিদ্বান তর্ক করেন যে এই অহিংসার ভাবনা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে এসেছে, অন্যথা হিন্দুরা তো হিংসক ও মাংসাহারীই ছিল।

এটিও এক ঐতিহাসিক ছল। **"অহিংসা পরমো ধর্মঃ"** এই শাশ্বত সিদ্ধান্ত এখানে সদাই বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রশ্ন জড়িত থাকায় বিষয়টিকে অধিক মহিমামণ্ডিত করা হচ্ছে। বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান অবশ্যই

ভারতবর্ষ, কিন্তু ভারতের অপেক্ষা তিব্বত থেকে শুরু করে চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্মের অধিক প্রচার ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অহিংসার প্রতি এত শক্তিশালী ভাবনা সেখানে দেখা যায়না এই সকল দেশ প্রায়ঃ মাংসাহারী। সুতরাং ভারতে অহিংসার সিদ্ধান্তের মূল বৌদ্ধ ধর্মের কারণ—এই বক্তব্য অত্যন্ত দুর্বল এবং অহেতুক তর্ক। এটি বিদ্যা এবং শোধের নামে উপহাস এবং এতটাই নিন্দনীয় পক্ষপাত বিদ্যা এবং শোধ-এর নামে কলঙ্ক। শোধের অদ্যতন পরম্পরা বিদ্যার দ্বারা কর্ম ও অন্যভাবে বেশী প্রভাবিত হয়েছে, এতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দাসানুদাস, বিকাশবাদ এবং দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ অন্য মতবাদের পূর্বাগ্রহের পোষণবিদ্যার জন্য অহিতকর বলে সিদ্ধ হচ্ছে। এতে পূর্বাগ্রহগ্রস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও অগ্রসর হয়ে যুক্ত হচ্ছে।

উপসংহার

আমাদের পূর্ব কেমন ছিলেন? তাদের বসবাস খাদ্য-পানীয় জীবনযাত্রা কেমন ছিল? আমরা যদি এগুলিকে পবিত্র আদর্শ বলে অভিহিত করি, তাহলে আমরা গোঁড়া (Conservative) বলে পরিগণিত হব এবং তাঁদের মদ্যপ, মাংসাহারী, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বলে অভিহিত কারী বিদ্বানগণ উদার, বৈজ্ঞানিক, আরও অনেক কিছু (Liberal, Scholar) বিশেষণে বিভূষিত। ভারতীয় পরম্পরার পক্ষে লেখক, রাষ্ট্রবাদী বক্তা তো সাম্প্রদায়িক এবং ভারতীয়তা, রাষ্ট্রীয়তার বিরোধ এবং উপেক্ষা করা উদার ও বৈজ্ঞানিকতার সমর্থক বলে পরিগণিত হয়। ভারতীয়তার সমর্থন করলে সাম্প্রদায়িক, গৈরীকাকরণ হবে। নিন্দা করলে উদার বিদ্বান হবেন। একি অন্ধকার?

সর্বশেষ নিবেদন এই যে, ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে গোবধের প্রতি যে ক্ষোভ এবং ক্রোধ আছে, গো মাংস ভক্ষণের প্রতি যে রোষ এবং ঘৃণা আছে তা অনুধাবন করে এটাই বলতে হয় যে ভারতবর্ষের প্রাচীন নিবাসী গোমাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন না। ওঁদের গোভক্ষক বলে অভিহিত করা ইতিহাসের প্রতি, ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অপরাধ। আর্যরা গো কে মা বলতেন।

"গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ।"

।। ওম্ ।।

আর্য সমাজের নিয়ম

১। সমস্ত সত্যবিদ্যা এবং যাহা পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায়, সে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

২। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয় নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টীকর্ত্তা তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

৩। বেদ সমস্ত সত্য বিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন ও শ্রবণ-শ্রাবণ আর্য্যদের পরম ধর্ম।

৪। সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সর্বদা উদ্যত থাকিবে।

৫। সমস্ত কর্ম ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচার বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

৬। সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করিবে।

৭। সকলের সহিত প্রীতি পূর্বক ধর্মানুসারে যথাযোগ্য রূপে ব্যবহার করিবে।

৮। অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করিবে।

৯। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন উন্নতিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সকলের উন্নতিতে আপন উন্নতি জ্ঞান করিবে।

১০। সকল মনুষ্য সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম প্রতিপালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক ব্যক্তিগত হিতকারী নিয়ম প্রতিপালনে স্বতন্ত্র থাকিবে।

আচার্য উমাকান্ত উপাধ্যায় রচিত হিন্দী সাহিত্য

প্রকাশক ঃ আর্যসমাজ কলকাতা

১। আর্যসমাজ কলকাত্তা কা শতবর্ষীয় ইতিহাস
২। আর্যসমাজ কলকাতার শতবর্ষীয় ইতিহাস
(বঙ্গানুবাদ ঃ আচার্য প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ)
৩। যুগনির্মাতা সত্যার্থ প্রকাশ ঃ সন্দর্ভ দর্পণ
৪। ব্যাতীত কে যশ কী ধরোহর
৫। কাশী শাস্ত্রার্থ ঃ এক সমীক্ষা
৬। যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
৭। শ্রাবণী উপাকর্ম
৮। মুর্তিপূজা সমীক্ষা
৯। অর্থ শৌচ
১০। আর্যসমাজ কা পরিচয়
১১। বেদোঁ মেঁ গোরক্ষা যা গো বধ
১২। বেদে গোরক্ষা অথবা গোহত্যা
(বঙ্গানুবাদ ঃ পণ্ডিত নচিকেতা ভট্টাচার্য)
১৩। হংসামত কী মিথ্যা বাণী
১৪। কমিউনিষ্টোঁ কে মোর্চে পর স্বামী দয়ানন্দ
১৫। শ্রাদ্ধ তর্পণ
১৬। বেদ মেঁ নারী
১৭। কর্মকাণ্ড
১৮। প্রার্থনা প্রবচন